ধারাবাহিক রচনা

মহৎসঙ্গ

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

কাছেই কেদারঘাট, ভোরে মাঝে মাঝে গিয়ে বসতাম এক বিশাল বাঁধানো বটগাছের নিচে। সেখানে একজন সাধু থাকতেন। ভোরের আলো ফুটলে হাতের জলপাত্রটিতে গঙ্গার জল ভরে নিয়ে দূরে কোথাও শৌচে যেতেন। ফিরে এসে পাড়ে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে আবার জল ভরে অনেকটা চলে এসে, হাত-পা বালিমাটি দিয়ে মেজে ধুয়ে তারপর গঙ্গায় নামতেন।

আমি বসে বসে লক্ষ করতাম, মনে পড়ে যেত লীলাপ্রসঙ্গে পড়েছি, ঠাকুর গঙ্গায় নেমে কুলকুচোর জল নিজের হাতের ওপর ফেলতেন। এই গঙ্গাভক্তি সাধুসমাজের সর্বত্র যা গৃহীদের ক্ষেত্রে উলটো, তারা সব বর্জনীয় বস্তু গঙ্গায় ফেলতে অভ্যস্ত। তারপর স্নান করে, কাপড় ছেড়ে, গাছের কোটরে রাখা একটা ছোট পুঁটুলি নামাতেন। সেটি খুলে একটি ছোট কর্পূরদানি ও ঘণ্টা বেরোত। ঘণ্টাধ্বনি করে কর্পূর দিয়ে মা গঙ্গাকে আরতি করতেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট বাচ্চা এসে হাজির, তাদের হাতে একটি একটি করে নকুলদানা দিতেন। এই নিত্যপূজার সারল্য ও জীবনচর্যার অনাড়ম্বরতা দেখে পূজনীয় বিমল মহারাজের কথা মনে হত। কারণ কত সামান্যে যে জীবন চলে, তা দেখার চোখ তিনিই খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রব্রজ্যার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বলতেন, ''ওরে, এদের মধ্যে দিয়েই তো ভারতের প্রাণশক্তিকে অনুভব করা যায়।''

দোতলার ঘরের জানালা থেকে সামনে এক পাহাড়ের ওপরে একটা মন্দিরের আভাস দেখতাম। আভাস বলছি এইজন্য যে, পাহাড়ের ওই অংশটি অতি সূক্ষ্ম হয়ে যেন আকাশের গায়ে খোঁচা মারত। কৌতূহলবশে এক বিকেলে পাহাড়টিতে উঠতে শুরু করলাম। পায়ে চলা রাস্তা তাই বেশ খাড়াই। হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছে দেখি সামনে একটি ছোট শিবমন্দির, যার দরজার একটি পাল্লা আছে অপরটি নেই। সেই খোলা অংশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরে শিবঠাকুরের পাশে ছোট্ট জায়গায় একটি কম্বল পাতা আর বাইরে একটি তিন পাথরের উনুন। বুঝলাম কেউ আছেন। উঁকিঝুঁকি মারছি, এমন সময় মন্দিরের পেছন থেকে ডাক এল, ''আইয়ে মহারাজ, ইস তরফ আইয়ে।'' মন্দির প্রদক্ষিণ করে পেছনে গিয়ে দেখি এক সাধু কম্বল গায়ে দিয়ে বসে আছেন। প্রণাম করে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, ''আপনি এখানে কতদিন আছেন?''

ভারি মিষ্টি গলার স্বর, বললেন, ''গঙ্গোত্রী ফেরত আসছিলাম নিচে, শহরের অত ভিড় ভাল

লাগে না। পথে একজন স্থানীয়, এই পাহাড়ের পাশের গ্রামের অধিবাসী, কৃপা করে আমাকে নিয়ে এসে এই মন্দিরটি দেখিয়ে, সাতদিনের মতো আটা আর ডাল দিয়ে গেছে। তাই রয়ে গেছি।"

বললাম, ''কিন্তু দরজার একটা পাল্লা নেই, আশে পাশে কোনও বসতি নেই, শীতের কথা তো ছেড়েই দিলাম, বন্য জন্তুর ভয়ও তো আছে।" অতি সহজ নির্ভার উত্তর এল, ''শিবজী হ্যায় না!"

জিজ্ঞাসা করলাম, ''নিচে যান না?" খুব নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, ''কই এখনও তো দরকার পড়েনি।" দুটি কম্বল সম্বল করে, খালি পায়ে চারধাম ঘোরার পথে একা এসে এখানে কদিন আছেন, আবার বেরিয়ে পড়বেন শিবজী-নির্ভর সাধুটি। বিকেলের গেরুয়া আকাশের প্রেক্ষাপটে, পাহাড়চূড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে এই বৈরাগ্যকে কেমন সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হল। কিন্তু নিচে নেমে অনেক দোকানপাট আর মানুষের মাঝে, বৈরাগ্যের এই অভয়রূপটির কথা ভাবতে গিয়ে বুক দুরদুর করতে লাগল। মনে হল এই 'অরতির্জনসংসদি' ভাবটিই বা কত তপস্যার ফল কে জানে!

গঙ্গোত্রীতে দুপুরবেলায় কনকনে ঠান্ডা ঘর থেকে বেরিয়ে রোদে বসব বলে ঠিক করছি। দেখলাম একটা বড় গাছের নিচে কম্বল গায়ে দিয়ে একজন সাধু বসে। কাছে গিয়ে একটু প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি টাকা দেখে ভাঙা হিন্দিতে বললেন, ''টাকা তুলে রাখো, লাগবে না।" আমি আবার অনুরোধ করলাম, ''সামান্যই তো, নিন।" বললেন, ''টাকা নিয়ে কী করব? যদি একটা প্লাস্টিকের টুকরো দিতে পার বরং দাও, বৃষ্টিতে মুড়ি দিয়ে বসতে পারি।" আমি বললাম, ''ঠিক আছে মহারাজ, আমি বাজারে দেখি পাওয়া যায় কি না।"

পাহাড়ে ঘোমটা সমেত পিঠ ঢাকা দেওয়া এক ধরনের বর্ষাতি ছিল, খুবই সস্তার। গঙ্গোত্রীতে তখন ছোট্ট বাজার, কোথাও সে-জিনিস পাওয়া গেল না, দোকানদার বলল, ''উত্তরকাশীতে পাবেন।" কী করি, ফিরে এসে সাধুটিকে বললাম, ''মহারাজ এখানে কোথাও পাওয়া গেল না, আপনি তো উত্তরকাশী নেমে যাবেন, সেখানে কিনে নেবেন, এই টাকাটা রাখুন।" প্রথমে আপত্তি করলেন, তারপর কী মনে করে নিলেন।

এই ছোট ছোট ঘটনাগুলি, তার কৃচ্ছ্রতা, অনাসক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে ওই পাহাড়ের উচ্চতায় কেমন মানানসই হয়ে থাকে। নেমে এসে চিন্তা করলে বুঝি এ-সংসারে অতি ক্ষুদ্র ত্যাগের পেছনেও কত প্রস্তুতি, পরিশ্রম; আর কম্বল সম্বল করে নগ্নপদে, পাহাড়ের ওই উচ্চতার ঠান্ডায় অনাসক্ত জীবনের পিছনে প্রস্তুতি কতটা, তার পরিমাপ কে করে! ঈশ্বরের কৃপা বিনে এ-শক্তিলাভ সম্ভব নয়।

কনখলে 'সাধনা সদন'-এ থাকার সময় দেখতাম, রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালের পাঁচিলের বাইরে এক কম্বল মুড়ি দেওয়া মানুষ আধশোয়া হয়ে থাকতেন রাস্তার দিকে পেছন ফিরে, পায়ে ঘা। এক সাধু বললেন, ''এ কারও কাছে কিছু চায় না, দিলেও পড়ে থাকে। এক সবজিওলা রোজ দুটো বড় আলু দিয়ে যায়, কাঠকুটো জ্বেলে তা সেদ্ধ করে খায়, আবার ঠিক ওইরকম করেই শুয়ে পড়ে থাকে।" শুনলাম, আশ্রমের মঞ্জুনাথ মহারাজ একবার তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তিনি হাতের চ্যানেল ইত্যাদি খুলে ফেলে চলে আসেন। অবশ্য এই ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করা হয়নি। পরের বার গিয়ে দেখি মানুষটি আর সেখানে নেই, জিজ্ঞাসা করে জানলাম তাঁকে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা তুলে নিয়ে গিয়ে কোথাও রেখে এসেছে। বিকেলে এক সাধুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে নীলধারায় গিয়ে দেখি বাঁধের নিচে গাছে ঘেরা এক জঙ্গলে একটা কী নড়ছে। সঙ্গের সাধুটি বললেন, ''ও কিছু না, সেই পাঁচিলের পাশে থাকা মানুষটি।" আমি হতভম্ব, এই

জঙ্গলে, যেখানে ত্রিসীমানায় কেউ নেই, সেখানেও একইভাবে শুয়ে এ কে! হয় পূর্ণজ্ঞানী, নয় তামসিকতার চূড়ান্ত। কিন্তু তামসিকতায় শুধু তো আলস্য ও ঘুম নয়, ভয় ও ক্রোধও সমভাবে থাকে। পরের বছর গিয়ে শুনলাম মানুষটি দেহ রেখেছেন। এ-হেঁয়ালির সমাধান হয়নি।

কনখলে সাধনা সদনের গঙ্গার ঘাটে বসে আছি দুপুরে। পরিচিত সাধুটি আর একজন সাধুকে সঙ্গে করে এনে পরিচয় করিয়ে বললেন, ''ইনি দক্ষিণ দেশ থেকে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছেন।'' যিনি পরিচয় করালেন তাঁকে আমি বললাম, ''তার মানে রমতা সাধু।'' তিনি শুনে পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, ''রমতা মানে তুমি কী বোঝ? যাঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়ান? যাঁরা কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ান তাঁদের কোনও জায়গাই ভাল লাগে না তাই, অথবা নতুন নতুন দেশ দেখার ইচ্ছায় ঘোরেন। রমতা মানে 'রমন্তে ইতি'। সাধু কীসে রমণ করেন, আনন্দ পান জানেন তো? 'বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ/ ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ'। তাঁর আনন্দ শুধু বেদান্তসিদ্ধান্তে, জীবন যদৃচ্ছালাভে, তাই তিনি নির্ভারচিত্তে, স্থানবিশেষে আকৃষ্ট না হয়ে, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ান—'অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ'। এরকম মানুষই 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'। সে অনেক দূরের কথা।''

মনে হল তাই তো, কথাটা তো এভাবে ভাবিনি কখনও! তারপরেই মনে হল আমার কী ভাগ্য, আমি সেরকম মানুষ দেখেছি; তিনি বিমল মহারাজ। তাঁর পরিব্রাজনকাল তো এইরকমই ছিল, আর সে-আনন্দে ডুবে থাকতেন বলেই তো সকলকে তাদের মতো করে আনন্দে রাখতেন কত সহজে।

জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে এসে পেলাম ও হারালাম এক সাধুকে, যাঁকে নিয়ে এ-লেখা শেষ করব। যোগযুক্ত সমদর্শী পুরুষ সকলের মধ্যে নিজেকে আর নিজের মধ্যে সকলকে দেখেন। পূজনীয় বিদ্যানন্দজীর দেওয়া 'সর্বাত্মানন্দ' নামটি গীতার এই শ্লোকটির আধারেই যেন সার্থক হয়ে উঠেছিল। সার্থক হয়েছিল সকলের মধ্যে তার গুণটি দেখে, তার মধ্যে তার সম্ভাবনাকে প্রবুদ্ধ করে দিয়ে। সার্থক হয়েছিল সকলের সুবিধে-অসুবিধের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁর সরল জীবনযাপনে, স্বামীজীর আদর্শের পায়ে আত্মবিলয়ে। আর এইসবই আড়াল করে রাখত তাঁর গুরুমা পূজনীয়া মোক্ষপ্রাণামাতাজীর কাছ থেকে পাওয়া মধুর হাসিটি। রামকৃষ্ণ-আদর্শে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কেমন করে সর্বগ্রাসী সন্ন্যাসীতে পরিণত হতে পারেন, তিনি তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মানুষের বহু সুকৃতির বলে অধ্যাত্মপথে মতি হয় আর ততোধিক সুকৃতির বলে এমন এক সাধুর সঙ্গ পাওয়া সম্ভব হয়।

তাঁর সঙ্গে আলাপই বা কদিনের! ২০১১-র ডিসেম্বর থেকে ২০১৮-এর শেষ। আন্তর্জাতিক স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার বেডেন পাওয়েল বলেছিলেন, ''A life well spent is a long life''—তাঁর জীবন তো তাই। আমার সেই সুরে বলতে ইচ্ছে করে—''An association well spent brings everlasting friendship''। বন্ধুত্ব শব্দটাই ব্যবহার করলাম কারণ তাঁর স্মৃতি 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ' মনে জাগরূক থাকবে। অপরিণত বয়সে বন্ধু পেয়েছিলাম স্বামী বিশ্ববেদানন্দজীকে, যিনি প্রায় হাত ধরে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন এই রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে। আর জীবনশেষে ঠাকুর জুটিয়ে দিলেন এই বুদ্ধিদীপ্ত প্রেমিক সন্ন্যাসীটিকে, হয়তো আমার শেষবেলার আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্যে। বিশ্ববেদানন্দজীর পিতৃসম বয়স, তাঁর সন্ন্যাস ও গেরুয়া আমাদের মধ্যে কোনও দূরত্ব রচনা করতে পারেনি। সে-বয়সে জগতের যত টান-বেটানের জটিলতা কত সহজে ভাগ করে নিতে পারতাম তাঁর সঙ্গে। তাঁর মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের অনুভব

হত। সে-ভাবটি আবার ফিরে এল নতুন করে যখন আমার আয়ুসূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। আমার বেসুর জীবনে জীবনদেবতার সুরে সুর মেলানোর চেষ্টায় কী অকুণ্ঠ সহযোগিতা! ভাবটি ছিল যেন তাঁর সাধনায় আমিও একজন সহযোগী। এই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়েই কতবার তাঁর আচরণের ভুল দেখাবার স্পর্ধা দেখিয়েছি। তিনি গুরুত্ব সহকারে ভেবেছেন, আবার ভবিষ্যতে সচেতন করার অনুরোধও জানিয়েছেন। তাঁর এই অমূল্য দীনতা দেখে এখন মনে হয় যে, আমার বয়সটাই হয়েছে, বুদ্ধির মার্জনা মোটেই হয়নি। গীতায় অর্জুনের মতো এখন মনে মনে চাই—''হে সন্ন্যাসী, আহারে, বিহারে, পরিহাসচ্ছলে যে-অমর্যাদা বা অসম্মান করেছি তার জন্য আন্তরিক ক্ষমা চাইছি।'' কিন্তু তিনি দোষই দেখেননি, তা ক্ষমা করবেন কী!

২০১১ সালে আমার হার্টে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হওয়ার ছমাস পরে আবার গেছি বোম্বেতে ডাক্তারের কাছে ষান্মাসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। ক্রিসমাস ইভে বোম্বে মঠে গিয়ে দেখা হল দুই খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর সঙ্গে। তাঁরা সেন্ট ফ্রান্সিসের সম্প্রদায়ভুক্ত 'ফ্রায়ার ব্রাদারস্'। তাঁদের ধর্ম সম্বন্ধে অতি উদার, প্রায় বৈদান্তিক মত দেখে মনে হল সেন্ট ফ্রান্সিস সম্বন্ধে নিবোধত পত্রিকায় যে-সন্ন্যাসীটি লিখছেন তাঁকে ফোন করা যাক। নম্বর জোগাড় করে ফোন করতেই অপরপ্রান্তে একটি আন্তরিক সহৃদয় কণ্ঠ ভেসে এল। পরস্পর পরিচয় প্রদানের পরে অপরিচিতের ব্যবধান এত শীঘ্র উঠে গেল যে অবাক হলাম। আমার দেবপ্রয়াগে তাঁর কুঠিয়া দর্শনের ইচ্ছা জানাতে তিনি উদার আমন্ত্রণ জানালেন, এবং তা যত শীঘ্র হয়।

ঠাকুরের কৃপায় দেরি হল না, বছর ঘুরতেই ফেব্রুয়ারির শেষে হাজির হলাম দেবপ্রয়াগ। মধ্যবয়সি, লম্বা-চওড়া, অতি মার্জিত ও শিষ্টাচার সমন্বিত সাধু। একটি বনেদি সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবার থেকে আসা বলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। পাশের একটি ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। তিনি রাঁধবেন, আমি রাঁধতে জানলেও তিনি দেবেন না অতিথি বলে। কিন্তু সেটি গৌণ, মুখ্য হল পরস্পরের কথার স্রোত। একটি পারস্পরিক অভাবের নিরসন হচ্ছিল যেন। বললেন, ''এখানে বেদান্ত নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে কিন্তু ঠাকুর, মা স্বামীজীকে নিয়ে কথা বলার লোক নেই, আর তাঁদের বাদ দিয়ে বেদান্ত আলোচনা নুনহীন তরকারির মতো।'' ঠিক আমার মনের কথাটি তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গিতে প্রকাশ পেল, আর বুঝলাম আমাদের মনের সাযুজ্য।

তখন মহারাজ তেমন কাজে জড়িয়ে পড়েননি, আশ্রম তৈরির উদ্যোগপর্ব চলছে, তাই প্রচুর অবসর। ভোরের চায়ের আসরের আলোচনা প্রাতরাশের আসরে পৌঁছে যাচ্ছে, আবার তা পেরিয়ে সূর্য যখন মাঝ-আকাশ ছুঁই ছুঁই তখন খেয়াল হত রান্না করতে হবে। ঠাকুর অনন্ত, তাঁর কথাও অনন্ত তাই রান্নার ফাঁকে ফাঁকেও চলত নানা সৎপ্রসঙ্গ। দুপুরে একটু একা হতাম প্রয়াগের ঘাটে বসে। বিকেলে হাঁটতে যাওয়া অলকানন্দার ঝোলা সেতু পেরিয়ে রামঘাটের রাস্তায় অথবা কখনও সেতু না পেরিয়ে রুদ্রপ্রয়াগের পথে পুরনো দিনের পায়ে চলা রাস্তায়। ওই চারটে দিন যেন চার বছরের খোরাক জুগিয়েছিল। রাতে খাওয়ার পর পাশের এক বন্ধ বাড়ির ছাদে চাদর মুড়ি দিয়ে পায়চারি। মহারাজের তপস্বিজীবনের কত চমকপ্রদ ঘটনা শুনতাম তাঁর মুখে। সময়ের এমন সদ্ব্যবহার আর কখনও করেছি বলে মনে পড়ে না।

ঠাকুর বলতেন ঘুঁটি সব ঘর ঘুরে চিকে ওঠে। যেটুকু শুনেছি তার ক্রমিক নির্মাণ করলে মহারাজের সব ঘুরে ওঠার পথটিই নজরে আসে। একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে। এ-ধরনের পরিবারে আড়াআড়ি, আবার পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া,

ত্যাগস্বীকার ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে কত সহজে জীবনবোধের শিক্ষা আয়ত্ত হয়ে যায়। এক কাকিমার কথা বলতেন যিনি স্কুল থেকে না ফেরা পর্যন্ত তাঁর জন্য না খেয়ে বসে থাকতেন। মায়ের সঙ্গে সারদা মঠে যাওয়া শুরু। একটু বড় হলে মঠের উৎসবে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করা। লেখাপড়ায় চিরকালই মেধাবী। কেমিস্ট্রি নিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করে সায়েন্স কলেজে পি এইচ ডি করা শুরু। শেষ না করে ব্যাঙ্কে ম্যানেজারের চাকরি। দীক্ষা হয়েছিল মোক্ষপ্রাণামাতাজীর কাছে, এখন মন বলতে লাগল এ-গতানুগতিক জীবন তাঁর জন্য নয়। একদিন মাতাজীকে প্রণাম করতে গেছেন, মাতাজী তাঁর দিকে এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিনিক্ষেপ করে জিজ্ঞাসা করলেন, ''জপধ্যান কেমন হচ্ছে?'' মহারাজ বললেন, ''এভাবে হবে না।'' প্রতিপ্রশ্ন হল, ''তা, কীভাবে হবে?'' মহারাজ বললেন, ''পালাতে হবে।'' ''পালাও না, কে আটকাচ্ছে'' বলেই মাতাজী বললেন, ''কী, নিজের কাছ থেকে পালাতে পারবে তো?'' যুবক বুঝলেন কথাটির অর্থ। নিজের অভিমান, অহংবোধ, ঠাকুরের ভাষায় 'কাঁচা আমি'র হাত থেকে পালাতে হবে, 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'। এর হাত থেকে নিষ্কৃতির ক্ষেত্র আলাদা, পথও আলাদা। সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন অনিশ্চিতকে নিশ্চিত করার উদ্যম নিয়ে।

প্রথম গন্তব্য গোয়ালিয়র আশ্রম। সেটি তখনও বেলুড় মঠভুক্ত হয়নি। সেখানকার অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দজী এমন এক উজ্জ্বল ব্রহ্মচারী পেয়ে উৎফুল্ল। আশ্রম পরিচালনায় একটি স্কুল আছে, তার অধ্যক্ষতার ভার পড়ল তাঁর ওপর। অফিসের কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজও তাঁকে দেওয়া হল। চিরকালই মনোযোগী, তাই অক্লেশে দায়িত্ব পালন করে স্বরূপানন্দজীর নির্ভরস্থল হয়ে উঠতে সময় লাগল না। কিন্তু মনে হতে লাগল, কাজ তো সেখানেও করতে হত, শাস্ত্রজ্ঞান না থাকলে মেলাব কীসের সঙ্গে! তাছাড়া চিরকালই পড়াশোনায় খুব প্রীতি, তাই শাস্ত্রপাঠের আগ্রহ বেড়েই চলল। বললেন একদিন স্বরূপানন্দজীকে, কিন্তু কে আর এমন নির্ভরযোগ্য সহকারীকে ছাড়তে চায়। কয়েকবার বলার পর তিনি বললেন, ''ছাড়তে তো তোমায় হবেই, নইলে তুমি পালাবে।'' তিনিই ব্যবস্থা করে দিলেন হৃষীকেশের কৈলাসমঠে পড়াশোনার। সেখানকার মণ্ডলেশ্বর বিদ্যানন্দজী শুধু শাস্ত্রজ্ঞই নন, সন্ন্যাসী হিসাবেও উচ্চমানিত। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যানন্দজীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। ফলে প্রকাশনা বিভাগ ও নবাগতদের পড়ানোর দায়িত্বও নিতে হল। কয়েক বছর পর সন্ন্যাস লাভের জন্য আবেদন জানালেন বিদ্যানন্দজীকে। তিনি জানালেন তাঁর গুরুর আশ্রম থেকে সংস্কৃত ভাষায় সম্মতিপত্র আনতে হবে। সারদা মঠ থেকে সংস্কৃতে লেখা সম্মতিপত্র অধ্যক্ষামাতাজীর সই নিয়ে পৌঁছে গেল বিদ্যানন্দজীর কাছে। সন্ন্যাস হয়ে গেল, নাম হল সর্বাত্মানন্দ।

কিন্তু সন্ন্যাসে কী হবে যদি একান্তে তপস্যা না করা হয়—একথা মনে পাক খেতে থাকে। একজন বললেন—দেবপ্রয়াগের আশেপাশে কুঠিয়া পেতে পার, দেখো চেষ্টা করে। সেই সন্ধানে দেবপ্রয়াগে এসে হাজির। সঙ্গম দর্শন করে রঘুনাথজীর মন্দিরে এলেন। বহু প্রাচীন মন্দির, রামচন্দ্রের রাবণহত্যার পাপস্খালনের তপস্যাস্থল। যুগযুগান্তরের আধ্যাত্মিকতার ভাব জমাট। মন্দিরের পূজারিকে দশটাকা দিয়ে বললেন, ''এখানে দুপুরে প্রসাদ পাওয়া যাবে?'' সন্ন্যাসীকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পূজারি বললেন, ''জানতা হুঁ তুমহারে পাস পয়সা হ্যায়, রখ লো, মিল জায়েগা প্রসাদ।'' দুপুরে খাওয়া হল—সুগন্ধি চালের ভাত, ঘন ডাল, খুব সামান্য সবজি ও ঘি। তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ''এখানে একটা কুঠিয়া পাওয়া যাবে?'' পূজারি বললেন, ''এই মন্দিরের লাগোয়া পাহাড়ের গায়েই

একটি গুহা-কুঠিয়া আছে, দেখো তোমার পছন্দ হয় কি না।" গিয়ে দেখলেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে গুহার দরজা, ঝুলবারান্দা দিয়ে সাজানো। এত ভাল তো আশা করেননি, ঠাকুরকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলেন। চলে এলেন এখানে, ভিক্ষা রঘুনাথজীর প্রসাদ, শুরু হল তপস্বিজীবন। প্রথমবার যখন তাঁর কাছে গেছি তখন তিনি আর সে-গুহায় থাকেন না, সেই পূজারির দেহান্তে নতুন পূজারি ভক্তদের কাছে তাঁর সম্মান ভাল চোখে দেখেননি, অতএব তাঁকে বিদায় জানিয়েছেন। তাই তাঁর তপস্যার জায়গা দেখতে একদিন গেলাম। রঘুনাথ মন্দিরের ভেতরে পাহাড়ের গায়ে তাঁর তপস্যার গুহায় উঠে এক অদ্ভুত অনুভূতি। নিচে প্রয়াগসঙ্গমের হর হর শব্দ। মাঝে মাঝে মন্দির থেকে ঘণ্টার মধুর ধ্বনি, চতুর্দিকে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের সবুজ বিস্তার, তার মাঝে এই গুহাতে এক সন্ন্যাসীর দীর্ঘ দশ বছর ধ্যানমগ্নতা, মনকে যেন অসাড় করে তুলেছিল।

তিনি সন্ন্যাসী, আমি গৃহী, তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তবু ভাববিনিময়ে পারস্পরিক পরিপূরক ও বন্ধু হয়ে উঠতে সময় লাগেনি একটুও এবং তার কৃতিত্ব পুরোটা তাঁরই। আমার অশেষ সৌভাগ্য যে তিনি আমার সঙ্গ পছন্দ করতেন।

বলতেন, ''পূজারিজী ছিলেন গার্জেন, পিতৃসম। সময়ে খাবার পাঠানো, শরীরের খবর নেওয়া, নিজের খরচায় দুধের ব্যবস্থা করে দেওয়া, এমনকী সন্ধ্যায় কুঠিয়াতে না ফিরলে তিরস্কার করতেও ছাড়তেন না। কেউ এলে তাঁর অনুমতি ছাড়া কুঠিয়ায় আসতে পেত না, বলতেন, 'ও সাধুমানুষ জপতপ করছে, ওকে এখন বিরক্ত করবে কেন?' একবার ধুতি নেই, ছিঁড়ে যাচ্ছে। ওদেশের ধুতি হলুদ ঝকমকে পাড়ওলা, যা পরা চলে না। দুটি মাত্রে এসে ঠেকেছে। একদিন সঙ্গম থেকে জপ করে ফিরতেই পূজারি ডাকলেন, 'শোনো, একজন ভক্ত রামজীকে দুটো ধুতি দিয়ে গেছে, তোমাদের বাঙালি ধুতি, নিয়ে যাও তোমার কাজে লাগবে।' কোথা থেকে যে সব জুটে যেত জানি না, তবে বুঝতে পারতাম গুরুশক্তি সর্বদা আছেন সঙ্গে।"

সেবার ফিরে আসার পরে আমার যাওয়া নিয়মিত হয়ে পড়ল। রামনবমীর উৎসবে তো বটেই, এছাড়াও অন্যসময়ে যেতাম, আমি বলতাম, 'হোমকামিং'। শুনে তিনি আনন্দিতই হতেন। একবার আশ্রমের তিনতলায় মহারাজের ঘরের সামনে খোলা ছাদে চায়ের সঙ্গে চর্চা চলছে, এমন সময় একজন বয়স্ক ওদেশি ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী উঠে এলেন। মহারাজ তাঁদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে আমায় বললেন, ''আমার কুঠিয়া-জীবনে ইনি আমার মাতৃসমা ছিলেন।" কথাটি শুনেই তিনি ছলছল চোখে আমাকে বলতে লাগলেন, ''প্রথম যখন আমি এই সুন্দর ছেলেটিকে দেখি তখন আমার মন কেমন করে উঠল। ভাবলাম এর মায়ের কী কষ্ট! এই গুহায় সাধু হয়ে আছে, ভাল খেতে পায় না, ওর মায়ের কষ্টটা যেন আমার মধ্যে হু হু করে উঠল। কিন্তু মন্দিরের পূজারি ওর কাছে খাবার নিয়ে যেতে দেবেন না, তাই প্রায়ই কিছু বানিয়ে বলতাম আজ আমাদের বিশেষ দিন তাই সাধুবাবাকে দেব।"

মহারাজ বলতেন, ''আমাদের বাঙালি মুখ, তরকারির পরিপাটি চাই, কিন্তু ভোগে ভাত ডাল আর সামান্য সবজি, হয়তো দু-কুচি ঢেঁড়স বা দু-কুচি আলু। মন বলত, ইস্ আর একটু হলে ভাল হত। এই নতুন মা আমাকে মাঝে মাঝে পকোড়া ভেজে পাঠাতেন, আমি আবার তার থেকে দু-একটি রেখে দিতাম পরের দিন খাব বলে। প্রতি মাসের প্রথমে একটি থলেতে করে টুথপেস্ট, ব্রাশ, সাবান ইত্যাদি পাঠিয়ে দিতেন। গুরুর কৃপায় শরীররক্ষার কোনও জিনিসের অভাব কখনও হয়নি।"

কয়েকবছর পর যখন মন একটু বহির্মুখ হল তখন মহারাজ ভাবলেন, এখানকার কয়েকটি

ছেলেকে পড়ালে কীরকম হয়? জুটে গেল কলেজে পড়া বেশ কিছু ছাত্র, তারা বিনা পয়সায় এমন শিক্ষক পেয়ে খুব খুশি। তাদের বেশ কয়েকজন এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, মহারাজের কাছে ঋণস্বীকার করে।

প্রথমদিকে তাঁকে বেশি করে পেতাম বন্ধুসুলভ সাহচর্যে। তবে আমার কাছে বাঞ্ছিত সময় ছিল ভোরবেলাটি। ঠাকুরের মন্দির থেকে নেমে এসে মাঝের ছাদটিতে বসতাম। রঘুনাথ মন্দিরের দিক থেকে সুব্বুলক্ষ্মীর বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রের সুললিত আবৃত্তি, বাতাসে তরঙ্গের মতো ভেসে এসে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে পড়ত। সামনের পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে লালচে আকাশ সূর্যোদয়ের আভাস দিয়ে যেত। মহারাজ ঠাকুরঘর থেকে নেমে দু-মগ চা করে নিয়ে এসে বসতেন। খানিক চুপচাপ, যেন এ-গম্ভীর হিমালয়ের ধ্যানভঙ্গ করতে ইচ্ছা হত না। তারপর মহারাজ নিম্নস্বরে প্রথমদিকের তপস্যার নানা কথা বলতেন। শুনতে শুনতে মনে হত হিমালয়ের প্রবহমান তপস্যা ও তপস্বিজীবনের এক খণ্ডাংশ চোখের সামনে, যার মধ্যে আমিও আছি। কিছু না করেও সে-তপস্যার আবেশ আমার মধ্যে প্রবেশ করত। আর সে-আবেশে চা প্রায়ই ঠান্ডা হয়ে যেত, মহারাজ আমাকে কিছুতেই সেটা দিতেন না, আবার নিজেই গরম করে নিয়ে আসতেন।

মহারাজের সঙ্গে একবার বদরিনাথ যাওয়া হল, সেবার সঙ্গে গৃহিণী ছিলেন। সেখানে মহারাজের অতুল সম্ভ্রম; রাস্তাঘাটে সকলেই প্রায় পরিচিত, প্রণাম করে। আমাকে নিয়ে গেলেন সেই ব্যবসায়ীর বাসাবাড়িতে, সেখানে সেই মাতৃসমা মহিলা তখন উপস্থিত। আমাদের দেখে তাঁর কী আকুলিবিকুলি! ''কেন তোমরা খবর না দিয়ে এসেছ, এখন কী খাওয়াই তোমাদের'' ইত্যাকার আক্ষেপ। দুধ দিয়ে তৈরি পায়েস জাতীয় একটা কিছু খাইয়ে তবে তাঁর তৃপ্তি। আসবার সময় মহারাজ বললেন, ''এইজন্যই খবর দিইনি, দিলে আর রক্ষা ছিল না।''

হোটেল-মালিক সবচেয়ে ভাল ঘর দুটি দিয়েছিল, অলকানন্দার ওপর ঝুলবারান্দা সমেত, মন্দিরের ঠিক উলটোদিকে। এদিকে অনভ্যস্ত গৃহিণী বমি ও মাথা-ঘোরায় শয্যাশায়ী। ঠাকুরকে বলছি, ''আহা এতদূর এসে শেষে দেবদর্শন হবে না?'' মহারাজও উৎকণ্ঠিত। তাঁর প্রভাবে হোটেলে ডাক্তার চলে এল, তিনি ওষুধ-ইনজেকশন দিলেন। পরদিন ভোরে একটু সুস্থ হতে মহারাজ নিজেই তাঁকে দর্শন করিয়ে আনলেন। আমাকে আগের দিনই করিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে সামনে গিয়ে প্রতি দেবদেবী ও তাঁদের আখ্যান শুনে ধন্য হয়েছিলাম।

পরদিন গেলাম ব্যাসগুহাতে, গাড়ি করে খানিক গিয়ে তারপর হেঁটে চড়াই ভেঙে গুহায় পৌঁছনো হল। সেখানে একটু জপ ও গান হল। মহারাজ কিছুদিন বদরিনাথে তপস্যায় কাটিয়েছিলেন, সেসময়ের কথা বললেন। ফেরার দিন হোটেল-মালিক ঘরভাড়া, খাওয়া কোনওকিছুরই পয়সা নিতে নারাজ। অন্তত খাওয়ার পয়সাটা জোর করে দিতে পারলাম। এরকম আধ্যাত্মিক প্রতিপত্তি আর দেখিনি।

শ্রীনগরে বেশ কয়েকবার আশ্রমের কেনাকাটার জন্য মহারাজের সঙ্গী হয়েছিলাম, সেখানেও একই অবস্থা। এক কাচের দোকানে ছবি বাঁধানো, আয়না ইত্যাদি কেনার ছিল, কেনা হলে—দাম যার প্রায় দুহাজার টাকা—কিছুতেই মালিককে নেওয়ানো গেল না। তিনি কেবলই বলতে লাগলেন, ''আপনার আশীর্বাদ আমার কাছে বেশি মূল্যবান।''

গৃহিণীর সঙ্গে মহারাজের সম্পর্কটি দাঁড়িয়েছিল মাতাপুত্রের। মহারাজ তাঁকে বলতেন, ''আপনার সঙ্গে কথা বললে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে।'' মহারাজ আমার বাড়িতে এলে তিনিও ছেলেকে খাওয়ানোর উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে থাকতেন। তাঁর সুগারের খবর নেওয়া ও উপদেশ দেওয়া, এমনকী

আমরা দিল্লি গেলে সেখানকার ভক্তমায়েদের মহারাজের প্রতি যত্ন নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতেন। এটি বলার উদ্দেশ্য মহারাজের সকলকে আপন করে নেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতাকে তুলে ধরা।

একবার বরোদা রামকৃষ্ণ মঠের এক সাধু দেবপ্রয়াগ আশ্রমে এসেছেন। অল্পবয়স আর খুব সরল। মহারাজকে বলছেন, ''জানেন মহারাজ, এমন জায়গায় থাকি যে, কেউ বেগুনভাজার নাম শোনেনি। কয়েকবার রাঁধুনিকে বেগুনভাজার কথা বলায় সে বেগুন কুচিয়ে একটা ঘ্যাঁট এনে হাজির করল। আশ্চর্য! বেগুনকে বড় করে কেটে ভাজা কি বিরাট কিছু রান্না!'' মহারাজ খুব কৌতুকভরে শুনলেন। আমার তাঁকে নিয়ে সঙ্গমে স্নান করতে যাওয়ার কথা। আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, ''দেখবেন তো বাজারে বড় বেগুন পাওয়া যায় কি না!'' সঙ্গমে স্নান করে এক দোকানে পেলাম শুকনো মতো দুটি। নিয়ে আসার পর মহারাজ সে-দুটিকে কেটে নুন-হলুদ মাখিয়ে সাধুটিকে খেতে ডাকলেন। তিনি খাচ্ছেন আর মহারাজ একটি একটি করে গরম বেগুনভাজা দিচ্ছেন। সেদিন তিনি খেয়েই চলে যাবেন, তাই একটু হালকা খাবেন বলেছিলেন। কিন্তু বেগুনভাজার কল্যাণে ভালই খাওয়া হল। আমি চুপ করে বসে সাধুটির আনন্দে চোখ বুজে খাওয়া ও মহারাজের মুখে বাৎসল্যের আনন্দ দেখছিলাম। তিনি চলে গেলে মহারাজ বললেন, ''বেগুনভাজা খাইয়ে যে এত আনন্দ পাওয়া যায় তা জানতাম না।'' মনে মনে ভাবলাম, অন্তরে নির্মল বাৎসল্যের উদয় হলে তবেই তো পরিচিত-অপরিচিতের ভেদ ঘোচে, আর এ-আনন্দ পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসের অর্থ আসক্তি ও অভিমান ত্যাগ, বাহ্য চিহ্নে নয়, এটি শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগের বিশেষত্ব। এটি বিশেষভাবে প্রকাশিত ছিল মহারাজের জীবনে। টাকা আসত যেমন বেরিয়ে যেত তেমনই, সাঁকোর তলা দিয়ে জলের মতো। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য তো তাঁর লেখাতেই প্রকাশ পেত। নিবোধত পত্রিকায় নিয়মিত বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্য ও তার ভাবানুবাদের প্রকাশ তারই প্রমাণ। এটি রামকৃষ্ণ মঠের অনেকেই পড়তেন ও তাঁকে সাধুবাদ দিতেন।

অপরের সামান্য গুণকে সামনে নিয়ে এসে তাকে সম্মান জানানোর উদারতা সর্বদা দেখেছি তাঁর মধ্যে। আমার অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও জ্ঞানকেও উচ্চসম্মান দিতেন, এতটাই তাঁর নিরভিমানিতা ছিল। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্' মূর্ত ছিল তাঁর মধ্যে।

উদ্বোধন থেকে সারদানন্দ মহারাজের একটি ইংরেজি বইয়ের অনুবাদের কাজ এল। আমি ইতস্তত করছি। তিনি শুনে খুব উৎসাহ দিলেন, বললেন—বাংলা অংশগুলো পাঠাবেন, পড়ব। অনুবাদের যে-সাধারণ দোষ—ইংরেজি লেখাকে সরাসরি অনুবাদ করলে পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হয়—তা যাতে না হয় সেকথা বলতেন। আমার পাঠানো অংশগুলি সাগ্রহে পড়তেন, পরামর্শও দিতেন। বলতেন, ''পরমগুরুকে নিয়ে কাজ করছেন, দেখবেন যখন শেষ হবে তখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগবে।'' সত্যি তাই, শেষ হতে দেখেছিলাম তাঁর কথা কতখানি সত্যি। শত কাজের মধ্যেও তাঁর পড়ার নেশা তাঁকে সানন্দে এই কাজটি করাত আর আমি উপকৃত হতাম খুব। শুধু শেষ অংশটুকু দেখে যেতে পারেননি, বই বেরোলে তাঁকে দেওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে রইলাম।

অনেক জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন, তার মধ্যে চন্দ্রবদনী মায়ের মন্দির দুবার। সেখানে মহারাজ গর্ভমন্দিরে ঢুকে বসতেন আর আমাকে নাটমন্দিরে বসে মায়ের গান করতে বলতেন। তাঁর নিমগ্ন অবস্থাটি খুব ভাল লাগত। এছাড়াও রুদ্রপ্রয়াগ, কোটেশ্বর শিবমন্দির ও সে-অঞ্চলের বহু মন্দির দর্শন তাঁর ব্যবস্থাপনায় করিয়েছেন। একবার রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে কোটেশ্বর শিবের মন্দিরে গেছি—

অনেক নিচে নেমে প্রায় মন্দাকিনীর পাড়ে। বেশ বড় চাতাল, মন্দির, কী শান্ত! বড় বড় গাছে ছাওয়া, খোলামেলা মন্দিরে শিবঠাকুর ও নন্দী যেন হিমালয়ের সামগ্রিক ধ্যানমগ্নতাকে ধরে রেখেছেন। একটা বেলগাছের নিচে কিছু বেলপাতা আর একঘটি জল রাখা ছিল, হয়তো আমাদেরই মতো কারও জন্য। মনের আনন্দে পুজো করে বসে রইলাম।

আশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ভক্তদের আসা-যাওয়া বাড়তে থাকে, টাকাও অনেক আসতে থাকে, কিন্তু এমন নিস্পৃহতা খুব কম দেখেছি। মাস্টারমশাইকে ঠাকুরের উক্তি ''উগুনোর জন্যে অত ভেবো না।'' তাঁর শিক্ষা ছিল, টাকা আসবে যাবে সাঁকোর তলা দিয়ে জল চলে যাওয়ার মতো। সত্যিই মহারাজের কাছে টাকা ছিল সাঁকোর তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া জলের মতোই। আমার বাড়ি এলে কোনও মন্দিরে নিয়ে গেলে পুরোহিতকে পকেটে যা আছে দিয়ে দিতেন, সেটা পাঁচশো টাকার নোটই হোক বা হাজার টাকার। মায়ের ইচ্ছায় পাহাড়ের গায়ে আশ্রমটির নির্মাণে টাকার অভাব হয়নি কখনও।

শেষবার দেবপ্রয়াগ গেলাম তাঁরই সঙ্গে। আমার তখন একা একা পথ চলা বন্ধ হয়ে গেছে। দিল্লি গিয়ে দেখি মহারাজ এসেছেন। একদিন গৃহিণীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে ঘুরে এলাম। তারপর তাঁর সঙ্গ ধরে বেরিয়ে পড়লাম। সৌভাগ্যক্রমে একই কোচে টিকিট পাওয়া গেল। নানাকথায় হরিদ্বার পৌঁছতে দেরি হল না। সেবার হরিদ্বারে একদিন একরাত কাটালাম তাঁর সঙ্গে। দুর্গাপুজোর বাজার করা ছিল, তার ফাঁকে ফাঁকে ব্রহ্মকুণ্ড ও আশেপাশে আনন্দে ঘুরে বেড়ানো সারা জীবনের স্মৃতি হয়ে রইল। পরদিন ভোরে পরিচিত নেগীজীর গাড়িতে দোকাদাররাই মালপত্র তুলে দিল। বেরোলাম যখন, গাড়ির কাচের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার ওপারে লাল সূর্য তার পরশ রাখছে আমাদের মাথায়। পৌঁছে গেলাম দেবপ্রয়াগ। সাতটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল। তর্পণ চলছিল, মহালয়ার দিন সঙ্গমে পিতৃতর্পণের উদ্‌যাপন করলাম। পরদিন থেকে নবরাত্রির চণ্ডীপাঠ শুরু। মহারাজ আমাকে প্রথম দিন চণ্ডীপাঠ করতে বললেন। সকালে একটা নতুন ধুতি নিয়ে তিনি হাজির। আমি যত বলি আমি ধুতিই পরি তাই আমার নতুন ধুতিও আছে, কিন্তু তিনি দেবেনই। বললেন, ''আশ্রমের নতুন ধুতি পরে চণ্ডীপাঠ করতে হয়।'' ঠাকুরের দয়ায় ভালভাবে সব হয়ে গেল। পরদিন আমার চলে যাওয়ার কথা। একটা বিদায়ের ভার মনে ঠাঁই নিয়েছে। বিকেলে একা ছাদে বসে আছি। ক্রমশ আলো ম্লান হয়ে আসছে। ভাবলাম এ তো শুধু দৃশ্যে নয়, জীবনের আলোও তো ম্লান হয়ে এল। ''আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে/ তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে''—ঠাকুর তো কতই নিখুঁত সুর বাজালেন কানে, কিন্তু আমার সুর তার সঙ্গে মেলাতে পারলাম কই! তারপরই মনে হল, তিনি যখন নিখুঁত সুরের কান তৈরি করতে এতজনকে পাঠিয়েছেন, তিনিই সময় হলে কান মুচড়ে মুচড়ে এ-তানপুরার সুর বেঁধে নেবেন, আমি ভেবে মরি কেন। মনটা ভাল হয়ে গেল। দিল্লি ফিরে সেবার বৃন্দাবন যাওয়ার কথা। মহারাজ বৃন্দাবন সম্পর্কে সমস্ত তথ্য হাতে লিখে একটি ম্যাপ তৈরি করে আমাকে দিলেন। আমার তীর্থযাত্রা সফল করতে তাঁর আগ্রহ ও বাড়ানো হাতটি ভুলব কোনওদিন! শুধু এই বিষয়েই নয়, সর্ববিষয়ে তাঁর বাড়ানো হাত আমাকে সমৃদ্ধ করেছে বারবার। পরদিন খাওয়া-দাওয়ার পর মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি মহারাজ তখনও চণ্ডীপাঠ করছেন, আমাকে ওখান থেকেই হাত তুলে বিদায় জানিয়ে দিলেন। তখন কি জানতাম এই শেষ দেখা!

শীত এল, মহারাজ সারদা সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে দিল্লিতে বলতে এলেন। ওই ঠান্ডাতে বক্তৃতার সময় তাঁকে ঘামতে দেখে, বক্তৃতা থামিয়ে তাঁকে

হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে হার্ট ব্লকেজ ধরা পড়ায় স্টেন্ট বসিয়ে দেওয়া হল। তিনদিন থেকে সুস্থ হয়ে, যে-ভক্তের বাড়িতে থাকতেন সেখানে ফিরে এলেন। সে-রাতে স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া করে শুলেন, কিন্তু ভোরে আর উঠলেন না। আগের রাতে তাঁর সুস্থতার সংবাদ পেয়েই পরদিন সকালে দুঃসংবাদ পৌঁছল ফোনে। ''তুলসী যব জগ্‌মে আয়ে জগ্‌ হসে তু রোয়/ এইসি করণী কর চলো কি তু হসে জগ্‌ রোয়।'' ঠাকুর তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। হয়তো আমাদের এইটুকুই পাওনা ছিল। মনে মনে বলি, ''দাগ দিয়েছ মর্মে আমার গো/গভীর হৃদয়ক্ষত।'' সে-ক্ষত আজও শুকোয়নি।

আজ জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে তলস্তয়ের একটি ছোট গল্পের কথা মনে হয় খুব। মার্টিন নামে এক মুচি খুব কুশলী ও সৎ। তার ঘরে একটিমাত্র জানালা, তাও নিচের দিকে। সে যেখানে বসে কাজ করে, সেখান থেকে রাস্তায় চলমান মানুষের নিচের দিকটি দেখা যায় কেবল। তাতে তার অসুবিধে নেই, কারণ সে জুতো দেখেই বুঝতে পারে যে, সেটি তার বানানো অথবা সারাই করা। অনেকদিন হল, দুটি ছেলের জন্ম দিয়ে তার স্ত্রী মারা গেছে। বড় ছেলেটি অল্পবয়সেই মারা গেছে, আর ছোটটি বড় হয়ে বাবার কাজে হাত দিয়েছিল, কিন্তু কয়েকদিনের জ্বরে সেও চলে গেল। মার্টিন হতাশ, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন হয়ে পড়ল। কিছুদিন বাদে এক পুরনো বন্ধু হাজির। সে তার হতাশা ও বিলাপ শুনে বলল, ''ঈশ্বরে বিশ্বাস হারানো পাপ। তাঁর কাজ কিছু বোঝা যায় না। তুমি যা চাও, তাতে তোমার ভাল হবে বলে তোমার ধারণা। কিন্তু তিনি জানেন কার কীসে মঙ্গল। আর হয়তো তাই তোমার সব কেড়ে নিয়ে তোমাকে মঙ্গলের পথে এগিয়ে দিচ্ছেন। তুমি যিশুর বাণী পড়ো, দেখবে মনে বল পাবে।'' মার্টিন সরল মানুষ, কথাটি তার মনে ধরল। সে একটা নিউ টেস্টামেন্ট কিনে রোজ পড়া শুরু করল। সে যতই পড়তে থাকল ততই সেই বাণীর মধ্য থেকে নতুন নতুন ভাব পেতে থাকল। দু-লাইন পড়েই সে গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। একদিন সেই অংশটি পড়ল যেখানে সাইমন যিশুকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করেনি। তার মনে হল যে, যদি যিশু তার কাছে আসতেন, তাহলে সে তাঁকে প্রাণ দিয়ে অভ্যর্থনা করত। এই ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় শুনল কেউ বলছে, ''কাল প্রস্তুত থেকো, আমি তোমার কাছে আসব।'' এটি কি যিশুরই কণ্ঠ? একটু দ্বিধা থাকলেও পরদিন সে ঘর পরিষ্কার করে জানালা ঘেঁষে বসে কাজ শুরু করল, আর মাঝে মাঝেই জানালার বাইরে তাকাতে থাকল। চলতি লোকের মধ্যে হঠাৎ দেখল যে, এক বৃদ্ধ সৈন্য রাস্তার বরফ সরাচ্ছে। কিন্তু বয়সের ভারে, অপুষ্টিতে, শীতে এখনই পড়ে যাবে মনে হচ্ছে। মার্টিন বেরিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে এসে আগুনের পাশে বসিয়ে, চা খাইয়ে সুস্থ করে বিদায় দিল। যিশুর পথ চেয়ে বারে বারে রাস্তার দিকে তাকাতে হচ্ছে। এবারে দেখে যে একটি মেয়ে তার শিশুপুত্রটিকে নিজের ছিন্ন কাপড়ে জড়িয়ে শীতে কাঁপছে। দেখেই বোঝা গেল সে অভুক্ত কয়েকদিন। তাকে ঘরে নিয়ে এসে মার্টিন নিজের খাবারের ভাগ থেকে তাকে দিয়ে, নিজের একটি কোট তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বিদায় দিল। এদিকে দিন শেষ হয়ে আসছে, যিশুর দেখা নেই। এমন সময় মার্টিন দেখে একটি আপেলওয়ালির ঝুড়ি থেকে একটি ছোট ছেলে আপেল চুরি করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে, তাকে আপেলওয়ালি খুব মারছে, আর পুলিশে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছে। সে বেরিয়ে ছেলেটিকে ছাড়িয়ে মেয়েটিকে বলল, ''আমরা এই সামান্য চুরিকে যদি ক্ষমা করতে না পারি, তাহলে যে-অঢেল পাপ আমরা করেছি তার জন্য যিশুর

কাছে ক্ষমা চাইব কোন মুখে?" মেয়েটি তার ভুল বুঝে চলে গেল।

সন্ধ্যায় আবার সেই বইটি নিয়ে পড়তে বসে সে ভাবতে লাগল, ''কই যিশু তো এলেন না!" এই গভীর ভাবনার মধ্যে সে শুনতে পেল যিশু বলছেন, ''মার্টিন, আমি তোমার কাছে তিনবার এসেছিলাম, আর প্রতিবারই তুমি আমায় যথোপযুক্ত আদর করেছ, তুমি আমার কাছেই আসবে।"

কেমন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, ঠাকুরও যেন আমার জীবনে অনেকবার এসেছেন। প্রথমবার পূজনীয় বিমল মহারাজ হয়ে, যিনি হাতে করে ধরে এ-রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যে নিয়ে এসে গুরুর চরণে সঁপে দিয়েছিলেন। তারপর প্রতিবার স্থলনের প্রাঙ্মুহূর্তে বিভিন্ন রূপ ধরে সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। আর এই শেষের দিকে এসেছিলেন তপস্বী হিমালয়ের তপঃপ্রবণতা একটু অনুভব করিয়ে দিতে, ধ্যানমগ্ন হিমালয়ের এক তপস্বিরূপে। হয়তো মার্টিনের মতো তাঁকে সমাদর করতে পারিনি, কিন্তু তিনি তো আমার কোনও যোগ্যতা নেই জেনেও এসেছিলেন! আজ পশ্চিম দিগন্তের লাল সূর্যের দিকে তাকিয়ে মনে হয় এ-লালিমা তো সকালেও ছিল! তাহলে এ কি শেষ, না নতুনের শুরু! এই শেষ ও শুরুর প্রান্তে যিনি আছেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে কবিগুরুর গানের এই পঙ্‌ক্তি দুটি মনে গুনগুনিয়ে ওঠে—

''ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে।"

হে সার্জেন্ট সাহেব, একবার আলোটি তোমার মুখের দিকে ঘুরিয়ে ধরো। ✠

লেখক-লেখিকার প্রতি

সবিনয় নিবেদন,

* নিবোধত পত্রিকার জন্য যে লেখাটি পাঠাতে চলেছেন তার একটি নকল অবশ্যই নিজের কাছে রাখবেন। **আমরা কোনও পাণ্ডুলিপি (মনোনীত বা অমনোনীত) ফেরত দিই না।**
* আপনার পাঠানো প্রবন্ধের সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরের উল্লেখ অবশ্যই করবেন।
* আগে কোথাও ছাপা হয়েছে এমন লেখা পাঠাবেন না।
* শুধু ধর্মীয় প্রসঙ্গ নয়—দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, বরেণ্য সাধক ও মহাপুরুষদের কথা নিয়ে ইতিবাচক লেখা আমরা প্রকাশ করি।
* আপনার লেখা ১৫০০ থেকে ২০০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* ধারাবাহিক রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হবে।
* সমালোচনার জন্য দুটি বই পাঠাতে হবে। কবিতা ও গানের বইয়ের সমালোচনা হয় না।
* ডাক মারফত ছাড়াও ইমেলে (nibodhatapatrika@gmail.com) লেখা পাঠাতে পারেন।
* প্রবন্ধের সঙ্গে তথ্যসূত্র দিলে নিম্নোক্ত ক্রম অনুসরণ করুন :
  লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশের স্থান ও বর্ষ, খণ্ড বা ভাগ (যদি থাকে) এবং পৃষ্ঠা। তথ্যসূত্র সম্পূর্ণ না হলে রচনা প্রকাশ করা হয় না।

—সম্পাদিকা